# জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠান

## ভাষণ

## মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

## শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, বুধবার, ০২ আশ্বিন ১৪২১, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪

---

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
প্রিয় সহকর্মীগণ,
আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ,
সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম। শুভ অপরাহ্ন।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এই শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ ও দু'লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

সুধিমন্ডলী,

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে দেশের পুনর্গঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরা ছাড়া তাঁর এ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আর এ জন্য জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জন ছিল অপরিহার্য।

দেশের বাইরে তখনও আমাদের দুতাবাসগুলো ভালভাবে চালু হয়নি। সে অবস্থায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিলাভের জন্য জাতির পিতা বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ও তৎকালীন বিশ্বনেতাদের সমর্থন আদায়ের পদক্ষেপ নেন।

বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, মানুষকে সহজে আপন করে নেওয়ার মত মানবীয় গুণ এবং কূটনৈতিক দূরদর্শিতায় স্বাধীনতা লাভের মাত্র আড়াই বছর পর ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। যা স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

১৯৭৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৯তম সম্মেলনে জাতির পিতা তাঁর প্রথম ভাষণ প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর এই দূরদর্শী ভাষণে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে জাতিসংঘ সনদ সমুন্নত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি শান্তি, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার, ন্যায় বিচার, নিরস্ত্রীকরণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নসহ মানুষের অব্যাহত অগ্রযাত্রায় তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন "সবার সাথে বন্ধুত্ব কারও সাথে বৈরিতা নয়" হবে স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি। জাতির পিতা প্রদর্শিত পররাষ্ট্র নীতির মূল আদর্শকে ধারণ করেই গত ৪০ বছর ধরে বাংলাদেশ পথ হাঁটছে। তাঁর আদর্শ আমাদের শান্তি ও বন্ধুত্বের পথে পরিচালিত করছে।

জাতির পিতার পররাষ্ট্র নীতির আদর্শই আমাদের "শান্তির সংস্কৃতি ও সহিংসতা বিরোধী" নীতিতে সবসময় অবিচল রেখেছে। ১৯৯৭ সালে গৃহীত জাতিসংঘের এ সংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রতি আমরা দৃঢ় সমর্থন দেই।

এ আদর্শের পথ ধরেই আমাদের নারী-পুরুষ বিশ্বের সংঘাত-সঙ্কুল এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ভাষা বৈচিত্র্য রক্ষা ও মাতৃভাষার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে বিশ্ববাসী আজ যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করছে - সে অর্জন এসেছে জাতির পিতা প্রদর্শিত পথ ধরেই।

সুধিবৃন্দ,

জাতিসংঘে ৪০ বছরের পথ-পরিক্রমায় আমাদের অনেক অর্জন রয়েছে। এর কোনটিই অনায়াসে হয়নি। যখনই আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্বে এসেছি, জাতিসংঘের সাথে আমাদের যোগাযোগ ও সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেছি। যা পারস্পরিক ব্যবধান কমিয়ে এনেছে।

আমাদের অর্জিত সাফল্যকে বিশ্বজনীন করেছে। অনেক দেশ আমাদের উন্নয়নের মডেল গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

আজকের এই বিশেষ দিনে আমরা আরও সামনের দিকে তাকাতে চাই। মাত্র ১০ বছর পরেই আমরা জাতিসংঘের সাথে আমাদের সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করব। এ সময়ের মধ্যে জাতিসংঘের সাথে আমাদের সম্পর্ককে আরও গভীর ও অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই।

আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিতে আমরা অটল রয়েছি। আমি আশা করি যুদ্ধ, সংঘাত ও সন্ত্রাস রোধে জাতিসংঘের সার্মথ্য বৃদ্ধি করতে আমরা সকল সদস্য রাষ্ট্র সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাব।

যুদ্ধ, সংঘাত মানবীয় বিপর্যয় ডেকে আনে। আমরা মানবীয় মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে একযোগে কাজ করতে চাই। আমরা মানুষের মননশীলতায় শান্তির সংস্কৃতি তৈরিতে কাজ করে যাব যাতে মানুষের মন থেকে যুদ্ধের বৈরি ভাবনাগুলো মুছে যায়। উন্নয়নের জন্য 'জনগণের ক্ষমতায়ন'- এ সত্য প্রতিষ্ঠায় আমরা কাজ করে যাব যাতে কেউ উন্নয়ন বঞ্চিত না হয়।

জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ এজেন্ডায় আমাদের অবস্থান সবসময়ই সামনের সারিতে। পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার, সমুদ্র, আকাশ এবং সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমরা আরও নিবিড়ভাবে কাজ করতে চাই। সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদ বিরোধী বৈশ্বিক সংগ্রামে আমরা স্বপ্রণোদিত হয়ে কাজ করতে চাই। রাজনৈতিক অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা দেশে মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি।

সমাজে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিরোধ করতে আমরা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে সর্বাত্বক সহয়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গণহত্যা প্রতিরোধে সারাবিশ্বে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, আমরা তার সাথে একাত্মতা পোষণ করছি। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার না হওয়ার সংস্কৃতি যাতে বন্ধ হয়, সেজন্য অপরাধের বিচার নিশ্চিত করার আন্দেলনে আমরা নীতিগতভাবে অগ্রগামী।

মায়ানমারের শরণার্থী সমস্যা সমাধানে আমরা কূটনৈতিক পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও করে যাব।

সুধিমন্ডলী,

এমডিজি অর্জনে অভাবনীয় সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আমরা ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আমাদের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাকে জাতিসংঘের মূল উন্নয়ন এজেন্ডার সাথে আমরা সঙ্গাতিপূর্ণ করেছি।

২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন কাঠামোর আওতায় আমরা এমন কিছু লক্ষ্য স্থির করতে একমত যা বিদ্যমান বাস্তবতায় আমরা অর্জন করতে পারব। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি আমরা জলবায়ু পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক অভিবাসন, দ্রুত নগরায়ন, অসংক্রামক রোগ এবং সমুদ্রসম্পদের টেকসই ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাই।

আমরা দেখতে চাই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং একটি মার্জিত কাজের নিশ্চয়তা পাচ্ছে।

আমরা চাই, উন্নয়নের জন্য অর্থবহ অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্ব বাণিজ্যের সুফল উন্নয়নশীল দেশগুলোও ভোগ করবে।

নারীর ক্ষমতায়নকে আরও সুদৃঢ় করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। নারীর প্রতি সহিংসতা, বাল্যবিবাহ এবং শিশু নির্যাতন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করেছি।

সকল শিশুর অধিকার নিশ্চিত করতে আরও নতুন নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

যুবশক্তিকে উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের সরকার সবসময়ই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে আমরা জাতিসংঘকে আমাদের পাশে দেখতে চাই।

জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ এবং সৃজনশীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে আমরা সহায়ক আইন ও নিয়ন্ত্রণের পরিবেশ সৃষ্টি করতে কাজ করছি। আমি চাই আমাদের শিশু ও যুব/যুব মহিলারা সত্যিকারের বিশ্বনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠুক। গর্বের সাথে নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধারণ করুক।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ জাতিসংঘে প্রবেশ করার আগেও বিশ্বের অনন্য এই প্রতিষ্ঠান সুখে-দুঃখে আমাদের পাশে ছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছিল। এখনও জাতিসংঘ আমাদের পাশে আছে। বাংলাদেশের মানুষ যোগ্যতা বলেই উন্নয়ন ও নিরাপত্তার দরকষাকষিতে এগিয়ে আছে।

বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের অংশিদারিত্বের ভিত্তিতেই পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জাতিসংঘের  মহাসচিব বান কি মুন আমাদের প্রশংসা করে বলেন, “বাংলাদেশকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের রোল মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর”।

বিশ্বের এক বিরাট অংশে আজ সংঘাত চলছে। এ সংঘাত কোনভাবেই মানুষের কল্যাণ আনতে পারে না। যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদের চাইতে আর কারও বেশি তিক্ত অভিজ্ঞতা নেই। ১৯৭১ সালে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অসম যুদ্ধে আমরা ৩০ লাখ মানুষকে হারিয়েছি। সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে দু’লাখ মা-বোনের।

সম্প্রতি গাজায় ইসরাইলী হামলায় শত শত নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছে। আমি এই হত্যার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। আমি ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করছি।

আজকে এই মহান দিনে আমি বিশ্ব নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানাব আসুন যুদ্ধ-সংঘাত বন্ধে আমরা আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেই। জাতিসংঘকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ করে দেই। আমরা যুদ্ধ-সংঘাত চাই না। শান্তি চাই।

জাতির পিতা জাতিসংঘে তাঁর ভাষণে যেমনটি বলেছিলেন: কোট-মানবিক বিপর্যয় এবং সংঘাত-সঙ্কুল এই বিশ্বে জাতিসংঘই মানুষের ভবিষ্যতের জন্য একমাত্র ভরসা। চলার পথে নানা বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে জাতিসংঘ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে মানবজাতির উন্নয়নে বিরাট অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশের তুলনায় বিশ্বে খুব কম দেশই আছে যারা এই বিশ্ব সংস্থার সুনির্দিষ্ট অর্জন এবং সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছে। আনকোট।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...